প্রথম আলো

কলাম

মতামত

প্রাথমিকে প্রশ্ন ফাঁস চক্র: ‘শয়তান জাল’ থেকে বেরোনোর উপায় কী

লেখা: রঞ্জু খন্দকার

প্রকাশ: ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ৪৮

দেশগ্রামের বিল-ঝিলে মাছ ধরার জন্য নতুন একধরনের ফাঁদ দেখা দিয়েছে, নাম ‘শয়তান জাল’। এই ফাঁদের ফাঁসগুলো এমন যে এর ভেতরে ঢোকা যায়, কিন্তু বেরোনোর পথ নেই।

দেখতে আলাদা হলেও শয়তান জাল অনেকটা বাঁশের দোয়ারির মতো। এ কারণে এর আরেকটা নাম চায়না দোয়ারি জাল। মলা, ঢেলা থেকে শোল, বোয়াল—বড়, ছোট এমন কোনো মাছ নেই, নিষিদ্ধ এ জালের হাত থেকে রেহাই পায়। এ কারণেই এর নাম শয়তান জাল।

সম্ভবত এ দেশের প্রাথমিক শিক্ষার নিয়োগপ্রক্রিয়া এমনই এক শয়তান জালের ফাঁদে পড়েছে, যার নাম প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্র।

কথা হলো, প্রশ্নপত্র ফাঁস তো গোটা দেশেরই সমস্যা। তবে শুধু প্রাথমিক নিয়ে আলাপ কেন? এর জবাব হলো, অন্যান্য বিভাগে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হলেও তা সফল করতে কয়েকটা স্তর (প্রিলিমিনারি, লিখিত, ভাইভা) পার হতে হয়। কিন্তু প্রাথমিকে শুধু প্রিলি পার করলেই হয়। ভাইভা অনেকটা 'আইওয়াশ'। নম্বর মাত্র ১০।

আপনি মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষক চাইবেন, আবার নিয়োগপ্রক্রিয়ায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের দুষ্টচক্র রেখে মাজাভাঙা শিক্ষক নিয়ে ততোধিক মাজাভাঙা কাঠামোয় বেতন দেবেন, তা তো হতে পারে না। সে ক্ষেত্রে দেশগ্রামের লোকে বলবে, 'আপনি তেলেও কম, ভাজা খাওয়ারও যম!'

যাহোক, প্রাথমিকে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের এই দুষ্টচক্রকে ব্যাখ্যা করা যায় একটি বিখ্যাত তত্ত্ব দিয়ে। এটিই আসল দুষ্টচক্র। এর নাম দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র। এর প্রবক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক র‍্যাগনার নার্কসে।

হাইস্কুল লাইফের কথা। তখন অর্থনীতিতে এই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র পড়ানো হতো। এই তত্ত্বের মূল কথা হলো কোনো দেশ গরিব, কারণ দেশটি গরিব।

আমরাও প্রশ্নপত্র ফাঁসের এই চক্র থেকে বেরোনোর পথ হিসেবে সরকারি 'বিনিয়োগে'র কথাই বলব। এ ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ হলো, কমপক্ষে তিন ধাপের নিয়োগপ্রক্রিয়ায় যাওয়া। এতে অর্থ, সময়, শ্রম ও নানা শর্তসাপেক্ষ ব্যাপার থাকলেও আরও উন্নত কোনো নিয়োগপ্রক্রিয়া না আসা পর্যন্ত আমাদের এটুকু বিনিয়োগ করতেই হবে।

১৯৫৩ সালে প্রকাশিত 'প্রবলেমস অব ক্যাপিটাল ফরমেশন ইন আন্ডারডেভেলপড কান্ট্রিজ' বইয়ে নার্কসে দেখান, কোনো দেশের মানুষ গরিব হলে তাঁদের সঞ্চয় কম হয়। সঞ্চয় অল্প হওয়ায় তাঁদের বিনিয়োগ কম হয়। সে কারণে তাঁদের উৎপাদন অল্প হয়। উৎপাদন কম হওয়ায় দেশটি গরিবই থেকে যায়। এই চক্র ঘুরেফিরে চলে।

স্কুল, কলেজ পেরিয়ে বুঝলাম, এই দুষ্টচক্র দিয়ে শুধু দারিদ্র্যকেই ব্যাখ্যা করা যায় না। এটি জীবনব্যাপী চলমান এক প্রক্রিয়া। যেমন এই চক্র দিয়ে দেশের চাকরির ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

দুষ্টচক্রের তত্ত্ব অনুযায়ী, কোনো বিভাগে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে কর্মী নিয়োগ হতে থাকলে সেখানে মেধাবী কর্মী কমে যায়। এ কারণে সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া চলে যায় প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের কাছে। তখন মেধাবীদের কর্মোদ্যম কমে যায়। ফলে আবার প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী কর্মী নিয়োগ হন।

এই তত্ত্বে একটা বিষয় যোগ করা যায়, কোনো ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি ফাঁস হয়ে গেলেও আগের ফাঁসকারী কর্মকর্তারা তেমন কোনো ব্যবস্থা নেন না বা নিতে দেন না। এভাবে ঘুরেফিরে চলতে থাকে।

এই চক্রের সঙ্গে প্রাথমিকে নিয়োগ পরীক্ষার লাগাতার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের মিল খুঁজে পান?

সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন উপজেলা/থানা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা (এটিইও) পদের নিয়োগেও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনও হয়েছে। কিন্তু দেশের বেশির ভাগ মিডিয়া সংবাদটি তেমন গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করেননি।

নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বা পরীক্ষাগ্রহণকারী বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনও (বিপিএসসি) বিষয়টি নিয়ে দৃশ্যত কোনো পদক্ষেপ/বক্তব্য দেয়নি।

ফেসবুকান্তরে জানতে পারলাম, বিষয়টি নিয়ে একদল পরীক্ষার্থী উচ্চ আদালতে রিট করতে যাচ্ছেন।

শুধু এটিইও নয়, এর আগে প্রাথমিকে প্রায় প্রতিটি সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায়ই প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। বলা চলে, প্রাথমিকে এ ধরনের অভিযোগ এখন মহামারি পর্যায়ে। এর সব অভিযোগ সত্য, তা বলার সুযোগ কম। আবার অনেকগুলোই যে ঠিক, গণমাধ্যমের বিভিন্ন প্রতিবেদন পড়লেও তা অনুমান করা যায়। গণমাধ্যমে ওঠা এমন একটি প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ কিন্তু হাসিনার বিরুদ্ধে চলমান গণ-আন্দোলনের বেগও বাড়িয়ে দিয়েছিল।

যাহোক, সর্বশেষ প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক পদে বড় ধরনের নিয়োগ হয় ২০২৩ সালে। এটিও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের তিরে বিদ্ধ। শুধু প্রশ্নপত্র ফাঁস নয়, এখন প্রযুক্তির এই যুগে ডিজিটাল জালিয়াতির মাধ্যমে এর উত্তরও বলে দেওয়া হয় ‘ডিভাইসের’ মাধ্যমে। ‘হল কন্ট্রাক্ট’ নেওয়ার পুরোনো রীতি প্রতিপালনের অভিযোগ তো রয়েছেই।

পত্রিকান্তরে খবর, ওই নিয়োগে শুধু গাইবান্ধাতেই পরীক্ষার হল থেকে ১৪০ জনকে ডিজিটাল জালিয়াতির অভিযোগে আটক করা হয়। (প্রথম আলো, ৯ ডিসেম্বর ২০২৩)

আটকের এই খবর অবশ্য আমাদের তেমন স্বস্তি দিতে পারে না, বরং অস্বস্তিই বাড়ায়—জালিয়াত সবাইকে কি আটক করা গেছে? যদি না করা যায়, তাঁরাও তো আজ শিক্ষক! দুষ্টচক্রের তত্ত্ব অনুযায়ী, তাঁরা কি এটিও নিয়োগেও জালিয়াতির চেষ্টা করবেন না?

এই যখন অবস্থা, তখন নতুন করে অস্বস্তি বাড়াচ্ছে প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের খবর। এবার এ পদে নিয়োগ হচ্ছে ২ হাজার ১৬৯ জন। দুশ্চিন্তার বিষয় হলো, প্রাথমিকের কান্ডারি হতে যাওয়া এই জনবল নিয়োগ হচ্ছে শুধু প্রিলিমিনারি ও নামমাত্র ভাইভা পরীক্ষার মাধ্যমে।

এমনিতেই প্রাথমিকে নানা পদের প্রধান শিক্ষক রয়েছেন। কেউ বিসিএস নন-ক্যাডার, কেউ সরাসরি নিয়োগ, কেউ পদোন্নতি, কেউবা চলতি দায়িত্বের। যেখানে নন-ক্যাডার হিসেবে নিয়োগ পাওয়া প্রধান শিক্ষকেরা বিসিএসের মতো তিন ধাপের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কমবেশি হাজার নম্বরের পরীক্ষায় পাস করে এখানে আসছেন, সেখানে সরকারের আবার কেন উল্টোযাত্রা?

আমরা তো জানি, উল্টো পদে হাঁটে ভূতেরা। যেখানে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগেই লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার দাবি উঠছে, সেখানে প্রধান শিক্ষক পদে এভাবে উল্টো নিয়োগের ভূত কার মাথায়, কেন, কাদের স্বার্থে চাপল?

স্মরণকালের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠা কোনো পরীক্ষাই কর্তৃপক্ষ বাতিল করে না। এর কারণও হয়তো আছে। এতে অভিযোগ সর্বাংশে সত্য প্রমাণিত না হওয়া। আর হলেও আবার পরীক্ষা নেওয়া অর্থ, সময়, শ্রম ও নানা শর্তসাপেক্ষ ব্যাপার।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিকার যেহেতু করা যাচ্ছেই না, তাহলে প্রতিরোধের ন্যূনতম উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে না কার স্বার্থে? একস্তরের পরীক্ষার ব্যূহ ভেদ করা যে ফাঁসকারীদের ‘ওয়ান-টু’র খেল, তা তো বারবার বোঝাই যাচ্ছে। তাহলে কমপক্ষে দ্বিস্তরের নিরাপত্তা কেন নেওয়া হচ্ছে না? কে না জানে, প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম?

এখন আসি দুষ্টচক্র থেকে বেরোনোর উপায়ের বিষয়ে। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ক্ষেত্রে অধ্যাপক নার্কসেসহ অর্থনীতিবিদেরা কয়েকটি পথের কথা বলেছেন। এর একটি হলো সরকারি বিনিয়োগ বাড়ানো।

আমরাও প্রশ্নপত্র ফাঁসের এই চক্র থেকে বেরোনোর পথ হিসেবে সরকারি ‘বিনিয়োগে’র কথাই বলব। এ ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ হলো, কমপক্ষে তিন ধাপের নিয়োগপ্রক্রিয়ায় যাওয়া। এতে অর্থ, সময়, শ্রম ও নানা শর্তসাপেক্ষ ব্যাপার থাকলেও আরও উন্নত কোনো নিয়োগপ্রক্রিয়া না আসা পর্যন্ত আমাদের এটুকু বিনিয়োগ করতেই হবে।

তা না হলে প্রাথমিক শিক্ষা সেই শয়তান জালের ফাঁদে আটকা পড়েই থাকবে, বেরোনোর আর পথ পাওয়া যাবে না।

রঞ্জু খন্দকার: সাবেক সাংবাদিক ও লেখক।

alamgircj@gmail.com

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৫ প্রথম আলো